একুশে পদক ২০১৭ প্রদান অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, সোমবার, ০৮ ফাল্গুন ১৪২৩, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

একুশে পদক ২০১৭-প্রাপ্ত গুণীজন,

এবং উপস্থিত সুধিবৃন্দ।

আসসলামু আলাইকুম।

একুশে পদক-২০১৭ প্রদান অনুষ্ঠানে আমি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি '৫২-র মহান ভাষা-আন্দোলনের বীর শহিদদের। গভীরভাবে স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে। একইসঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ এবং নির্যাতিতা দুই লাখ মা-বোনকে।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। ভাষা সৈনিক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রইল আমার সশ্রদ্ধ সালাম।

এ বছর যাঁরা একুশে পদক পেয়েছেন, আপনাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

সুধিবৃন্দ,

বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামী ইতিহাসে অমর একুশে এক উজ্জ্বল এবং মহান সংযোজন। মাতৃভাষার মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশপ্রেমিক বাঙালি তরুণদের এমন আত্মত্যাগ গোটা বিশ্ব-ইতিহাসেই বিরল। একুশের পথ বেয়েই আমরা পৌঁছেছি একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মোহনায়।

একুশ মানে মাথা নত না করা, মর্যদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা। একুশ মানে বাংলা, বাঙালি এবং বাংলা ভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ, নিরন্তর ভালোবাসা।

১৯৪৭ সালে করাচির শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একথা জানার পর মিছিল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বাড়ির সামনে প্রতিবাদ জানায়।

১৯৪৮ সালে ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা দেন যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন।

তার এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্রলীগসহ গোটা ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ছাত্রলীগ, তমুদ্দীন মজলিস এবং আরও কয়েকটি ছাত্র সংগঠন মিলে সর্বদলীয় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।

১১ই মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' ঘোষণা করা হয় এবং সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ জনগণকে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য সমগ্র দেশব্যাপী প্রচারাভিযান শুরু করে।

১১ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। ধর্মঘট চলাকালে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। সাধারণ ছাত্র-জনতা প্রবল আন্দোলনের মুখে মুসলিম লীগ সরকার ১৫ই মার্চ বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৬ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ভাষার দাবীতে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। পরে মিছিল নিয়ে নেতৃবৃন্দ খাজা নাজিমউদ্দিনের কাছে দাবীনামা পেশ করেন। কিন্তু ঐদিনই পুলিশ একদল ছাত্রের উপর লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। প্রতিবাদে ছাত্ররা পরেরদিন সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করে।

১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। তিনি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক জনসভায় ঘোষণা দেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। উপস্থিত ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোষণার

প্রতিবাদ করে। ২১শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আবারও একই ঘোষণা দিলে বঙ্গবন্ধুসহ উপস্থিত ছাত্ররা আবারও প্রতিবাদ জানায়।

ভাষার দাবী এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিদের দাবী আদায়ের জন্য অবস্থান ধর্মঘট করার সময় ১৯৪৯ সালের ১৯শে এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে আবারও গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান। ১৪ই অক্টোবর আওয়ামী লীগ ঢাকায় ভুখা মিছিল বের করে। মিছিল থেকে মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুসহ অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫২ সালের ২৫শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই আবারও ঘোষণা দিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।

এ সময় বঙ্গবন্ধু বন্দী অবস্থায় চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। হাসপাতালের কেবিনে প্রায়শই তিনি ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি নঈমুদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদকসহ ছাত্রনেতাদের সঙ্গে গোপনে বৈঠক করে আন্দালনের দিক নির্দেশনা দিতেন। এসব বৈঠক হত মধ্যরাতের পর। এরকম এক বৈঠকেই ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন:**"...পরের দিন রাতে এক এক করে অনেকেই আসল। সেখানেই ঠিক হল আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর করতে হবে।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ১৯৭)**

একইসঙ্গে তিনি ঘোষণা দেন ১৫ই ফেব্রুয়ারি মধ্যে তাঁকে মুক্তি না দিলে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করবেন। তাঁর সঙ্গে বরিশালের মহিউদ্দিন আহমদও থাকবেন।

অনশনের ব্যাপারে তাঁর অনড় অবস্থান দেখে কর্তৃপক্ষ ১৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁকে এবং মহিউদ্দিন আহমদকে ফরিদপুর জেলে পাঠিয়ে দেয়।

বঙ্গবন্ধু এবং মহিউদ্দিন আহমদ ১৭ই ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর কারাগারে পৌঁছেন। সেদিন থেকেই তাঁরা অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। তাঁর মৃত্যুর ঝুঁকিও দেখা দেয়।

জেলখানায় অনশনে থাকাবস্থায় তিনি ২১শে ফেব্রুয়ারির ঢাকার মর্মান্তিক ঘটনার খবর পান এবং ভীষণ মর্মাহত হন। একটানা ১১দিন অনশনের পর ২৭শে ফেব্রুয়ারি মুক্তির আদেশ আসে এবং তিনি অনশন ভাঙেন।

৫২'র ২১শে ফেব্রুয়ারির সেই বিয়োগান্তক ঘটনা রাতারাতি আমাদের মনন, চিন্তা-চেতনায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়।

আজকের প্রজন্মের মধ্যে একুশের তাৎপর্য কতটুকু গেঁথে গেছে জানিনে। কিন্তু আমরা যাঁরা পাকিস্তানী শাসনের মধ্যে বেড়ে উঠেছি, আমাদের কাছে একুশে ছিল এক অন্যরকম শক্তি, প্রেরণা, উদ্দীপনার উৎস।

ফেব্রুয়ারি মাস এলে আমাদের ধমনীতে রক্ত প্রবাহ বেড়ে যেত। আমরা সবকিছু ছিন্ন করে মুক্তির নেশায় মেতে উঠতাম। একুশ আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে আত্মত্যাগ করতে হয়, কীভাবে নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিতে হয়।

বঙ্গবন্ধু তাঁর মাঠপর্যায়ের আন্দোলন-সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভাষার দাবিকে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উন্নীত করতে হবে। তাই বাঙালির সকল সংগ্রামী সূত্রকে তিনি ১৯৭১-এ অভিন্ন এক বাক্যে রূপ দেন: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

আমরা জাতির পিতার নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তিনি বেঁচে থাকলে হয়ত এতদিনে আমরা অর্থনৈতিক মুক্তিও অর্জন করতাম। কিন্তু জাতির পিতাকে হত্যার পর দেশ উল্টোদিকে হেঁটেছে। একুশের ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মহৎ অর্জনগুলোকে ভুলুণ্ঠিত করা হয়েছে।

দীর্ঘ একুশ বছর পর ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায় বাংলার মাটি ও মানুষের রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। আমরা চেষ্টা করি হারানো গৌরব পুনোরুদ্ধারের। আমাদের সরকারের জনগণের জন্য গৃহীত ও বাস্তবায়িত অনেক কর্মসূচি ও সাফল্যের মধ্যে একটি ছিল একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

আপনারা জানেন, প্রয়াত রফিকুল ইসলাম, আবদুস সালাম প্রমুখ প্রবাসী বাঙালির উদ্যোগে এবং ১৯৯৬-২০০১ আমলের আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বাঙালির একুশ এভাবে পরিণত হয় সারা পৃথিবী মানুষের মাতৃভাষা দিবসে। একদিকে এটি যেমন অসাধারণ গৌরবের ঘটনা, অন্যদিকে তা গভীর দায়িত্ববোধেরও বিষয়।

দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার সুরক্ষা বিধানে ভূমিকা রাখার দায়িত্বও এখন আমাদের উপর অর্পিত। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

ইন্সটিটিউট; যেখানে পৃথিবীর সকল ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে গবেষণা এবং সংরক্ষণ ও চর্চার সুযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে স্ব স্ব ক্ষেত্রে থেকে ভূমিকা রাখার জন্য আমি একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আপনারা জানেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান করে বিশ্বের দরবারে এ ভাষার গৌরব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সরকার প্রধানের দায়িত্ব লাভ করে আমি নিজেও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে নিয়মিত বাংলায় ভাষণ দিয়ে আসছি। আমরা বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ঘোষণার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আমরা দেশের মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ এখন যেমন ঈর্ষণীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অধিকারী, তেমনি শিক্ষা ও সামাজিক সূচকেও আমরা অর্জন করেছি অসামান্য সাফল্য। বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে।

'৭১-এর ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ সফলভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছি। '৭১-এ দেশের সূর্যসন্তান বুদ্ধিজীবীদের যারা নৃশংসভাবে হত্যা করে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করেছে তাদের বিচারও এর মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হচ্ছে। আমরা কঠোর হাতে দমন করেছি জঙ্গিবাদ নামক অভিশাপ। এক্ষেত্রে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছি।

আজ আমরা গর্বভরে বলতে পারি, বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের কোন ঠাঁই নেই। যে দেশে বিশ্বের বৃহত্তম এবং দীর্ঘস্থায়ী বইমেলা হয়, যে দেশে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে লাখো জনতা নিদ্রাহীন রাত কাটায়, যে দেশে নববর্ষ উৎসবে রাজপথে মানুষের ঢল নামে, সে দেশে কখনও জঙ্গিবাদ শেকড় গাড়তে পারবে না।

জঙ্গিবাদের এই অনাকাঙ্ক্ষিত উপদ্রব মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সন্তানদের আরও বেশি করে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানাতে হবে। একজন সংস্কৃতিবান মানুষ কখনই ধর্মান্ধ হতে পারে না। কাজেই আমাদের সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ ঘটাতে হবে।

একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণীজন,

কথায় আছে, যে দেশে গুণের কদর নেই সে দেশে গুণীর জন্ম হয় না। আমরা গুণীজনদের তাঁদের প্রাপ্য সম্মান প্রদানের বিষয়ে আন্তরিক।

আমরা সাহিত্য-শিক্ষা-কৃষি-ক্রীড়া-প্রযুক্তিসহ উদ্ভাবনাময় সকল ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অর্জনের অধিকারী ব্যক্তিত্বদের পুরস্কৃত ও সম্মানিত করে আসছি। এরই অংশ হিসেবে আজকের এই একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠান।

রাষ্ট্রীয় এ পদকের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অমর একুশের নাম। যে মহান ভাষা শহিদগণ নিজেদের জীবনের বিনিময়ে একুশের সংগ্রামী ইতিহাস রচনা করেছেন, তাঁদের ত্যাগের দিকে লক্ষ্য রেখে আপনাদের মেধাকে দেশের উন্নয়ন, সমৃদ্ধ ও সার্বিক বিকাশের কাজে লাগানোর বিনীত আহবান জনাই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর দেশের পুনর্গঠনে দেশের বুদ্ধিজীবী ও মেধাবীদের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা কমিশনে তাই দেশসেরা অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন-গবেষক, সমাজ-বিশ্লেষকদের সমাবেশ ঘটেছিল।

বঙ্গবন্ধু যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন, দেশের মেধাবী নাগরিকগণই তাঁদের দায়বদ্ধ ভাবনার মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়তে পারেন। আমরাও বঙ্গবন্ধুর সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আপনাদের কৃতি, বিদ্যা ও শ্রম দেশের আপামর মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিবেদন করার আহ্বান জানাই।

সুধিবৃন্দ,

আমরা সম্প্রতি মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পঁয়তাল্লিশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছি। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী আমাদের সামনে সমাগত। একইসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষও অতিসন্নিকটে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রত্যাশা-অচিরেই বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অশিক্ষার অন্ধকারমুক্ত একটি উন্নত সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র।

সন্ত্রাস, হত্যা, নৈরাজ্য ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির বিরুদ্ধে উন্নয়নের গণতন্ত্রের মাধ্যমে বাংলার সাধারণ মানুষের সুখী-সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্ন আমরা অবশ্যই পূরণ করতে সক্ষম হব- এই প্রত্যাশায় আপনাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...